আল লাইল

৯২

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ ওয়াল লাইল (وَالَّيْلِ) –কে এই সূরার নাম গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

পূর্ববর্তী সূরা আশ্ শামসের সাথে এই সূরাটির বিষয়বস্তুর গভীর মিল দেখা যায়। এদিক দিয়ে এদের একটিকে অপরটির ব্যাখ্যা বলে মনে হয়। একই কথাকে সূরা আশ্ শামসে একভাবে বলা হয়েছে আবার সেটিকে এই সূরায় অন্যভাবে বলা হয়েছে। এথেকে আন্দাজ করা যায়, এ দু'টি সূরা প্রায় একই যুগে নাযিল হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

জীবনের দু'টি ভিন্ন ভিন্ন পথের পার্থক্য এবং তাদের পরিণাম ও ফলাফলের প্রভেদ বর্ণনা করাই হচ্ছে এর মূল বিষয়বস্তু। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এ সূরাটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগটি শুরু থেকে ১১ আয়াত পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় ভাগটি ১২ আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রথম অংশে বলা হয়েছে, মানুষ ব্যক্তিগত, জাতিগত ও দলগতভাবে দুনিয়ায় যা কিছু প্রচেষ্টা ও কর্ম তৎপরতা চালায় তা অনিবার্যভাবে নৈতিক দিক দিয়ে ঠিক তেমনি বিভিন্ন যেমন দিন ও রাত এবং পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে। তারপর কুরআনের ছোট ছোট সূরাগুলোর বর্ণনাভংগী অনুযায়ী প্রচেষ্টা ও কর্মের সমগ্র যোগফল থেকে এক ধরনের তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট এবং অন্য ধরনের তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট নিয়ে নমুনা হিসেবে পেশ করা হয়েছে। এই বৈশিষ্টগুলোর বর্ণনা শুনে এদের মধ্যকার পার্থক্য সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। কারণ এক ধরনের মৌলিক বৈশিষ্ট যে ধরনের জীবন পদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব করে অন্য ধরনের মৌলিক বৈশিষ্টে ঠিক তার বিপরীতধর্মী জীবন পদ্ধতির চিহ্ন ফুটে ওঠে। এই উভয় প্রকার নমুনা বর্ণনা করা হয়েছে ছোট ছোট, আকর্ষণীয়, সুন্দর ও সুগঠিত বাক্যের সাহায্যে। শোনার সাথে সাথে এগুলোর মর্মবাণী মানুষের মনের মধ্যে গেঁথে যায় এবং সে সহজে সেগুলো আওড়াতে থাকে। প্রথম ধরনের বৈশিষ্টগুলো হচ্ছে ঃ অর্থ–সম্পদ দান করা, আল্লাহভীতি ও তাকওয়া অবলম্বন করা এবং সৎবৃত্তিকে সৎবৃত্তি বলে মেনে নেয়া। দ্বিতীয় ধরনের বৈশিষ্টগুলো হচ্ছে ঃ কৃপণতা করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির পরোয়া না করা এবং ভালো কথাকে মিথ্যা গণ্য করা। তারপর বলা হয়েছে, এই উভয় ধরনের সুস্পষ্ট পরস্পর বিরোধী কর্মপদ্ধতি নিজের পরিণাম ও ফলাফলের দিক

থেকে মোটেই এক নয়। বরং যেমন এরা পরস্পর বিপরীতধর্মী, ঠিক তেমনি এদের ফলাফলও বিপরীতধর্মী। যে ব্যক্তি বা দল প্রথম কর্মপদ্ধতিটি গ্রহণ করবে তার জন্য মহান আল্লাহ জীবনের সত্য সরল পথটি সহজ লভ্য করে দেবেন। এ অবস্থায় তার জন্য সৎকাজ করা সহজ ও অসৎকাজ করা কঠিন হয়ে যাবে। আর যারা দ্বিতীয় কর্মপদ্ধতিটি অবলম্বন করবে আল্লাহ জীবনের নোংরা, অপরিচ্ছন্ন ও কঠিন পথ তাদের জন্য সহজ করে দেবেন। এ অবস্থায় তাদের জন্য অসৎকাজ করা সহজ এবং সৎকাজ করা কঠিন হয়ে পড়বে। এ বর্ণনা এমন একটি বাক্যের দ্বারা শেষ করা হয়েছে যা তীরবেগে হৃদয়ে প্রবেশ করে মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। সে বাক্যটি হচ্ছে ঃ দুনিয়ার এই ধন-সম্পদ যার জন্য মানুষ প্রাণ দিয়ে দেয়, এসব তো কবরে তার সাথে যাবে না, তাহলে মরণের পরে এগুলো তার কি কাজে লাগবে?

দ্বিতীয় অংশেও এই একই রকম সংক্ষিপ্তভাবে তিনটি মৌলিক তত্ব পেশ করা হয়েছে। এক, দুনিয়ার এই পরীক্ষাগারে আল্লাহ মানুষকে অগ্রিম কিছু না জানিয়ে একেবারে অজ্ঞ করে পাঠিয়ে দেননি। বরং জীবনের বিভিন্ন পথের মধ্যে সোজা পথ কোন্‌টি এটি তাকে জানিয়ে দেবার দায়িত্ব তিনি নিজের জিম্মায় নিয়েছেন। এই সংগে একথা বলার প্রয়োজন ছিল না যে, নিজের রসূল ও নিজের কিতাব পাঠিয়ে দিয়ে তিনি এ দায়িত্ব পালন করেছেন। কারণ সবাইকে পথ দেখাবার জন্য রসূল ও কুরআন সবার সামনে উপস্থিত ছিল। দুই, দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। তাঁর কাছে দুনিয়া চাইলে তাও পাওয়া যাবে আবার আখেরাত চাইলে তাও তিনি দেবেন। এখন মানুষ এর মধ্য থেকে কোনটি চাইবে—সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মানুষের নিজের দায়িত্ব। তিন, রসূল ও কিতাবের মাধ্যমে যে ন্যায় ও কল্যাণ পেশ করা হচ্ছে, যে হতভাগ্য ব্যক্তি তাকে মিথ্যা গণ্য করবে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য প্রস্তুত রয়েছে জ্বলন্ত আগুন। আর যে আল্লাহভীরু ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিস্বার্থভাবে নিছক নিজের রবের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজের ধন-মাল সৎপথে ব্যয় করবে তার রব তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং তাকে এত বেশী দান করবেন যার ফলে সে খুশী হয়ে যাবে।

وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشٰى ﴿١﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلّٰى ﴿٢﴾ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ
وَالْأُنْثٰى ﴿٣﴾ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ﴿٤﴾ فَأَمَّا مَنْ أَعْطٰى وَاتَّقٰى ﴿٥﴾
وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ﴿٦﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ
وَاسْتَغْنٰى ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ﴿٩﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرٰى ﴿١٠﴾
وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدّٰى ﴿١١﴾

রাতের কসম যখন তা ঢেকে যায়। দিনের কসম যখন তা উজ্জ্বল হয়। আর সেই সত্তার কসম যিনি পুরুষ ও স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। আসলে তোমাদের প্রচেষ্টা নানা ধরনের।[১] কাজেই যে (আল্লাহর পথে) ধন-সম্পদ দান করেছে, (আল্লাহর নাফরমানি থেকে) দূরে থেকেছে এবং সৎবৃত্তিকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে,[২] তাকে আমি সহজ পথের সুযোগ-সুবিধা দেবো।[৩] আর যে কৃপণতা করেছে, আল্লাহ থেকে বেপরোয়া হয়ে গেছে এবং সৎবৃত্তিকে মিথ্যা গণ্য করেছে,[৪] তাকে আমি কঠিন পথের সুযোগ-সুবিধা দেবো।[৫] আর তার ধন-সম্পদ তার কোন্ কাজে লাগবে যখন সে ধ্বংস হয়ে যাবে?[৬]

১. এ কথার জন্যই রাত ও দিন এবং নারী ও পুরুষের জন্মের কসম খাওয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, যেভাবে রাত ও দিন এবং পুরুষ ও নারী পরস্পর থেকে ভিন্ন এবং তাদের প্রত্যেক জোড়ার প্রভাব ও ফলাফল পরস্পর বিরোধী, ঠিক তেমনি তোমরা যেসব পথে ও যেসব উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছো সেগুলোও বিভিন্ন ধরনের এবং সেগুলোর পরিণাম বিভিন্ন বিপরীতধর্মী ফলাফলেরও উদ্ভব ঘটে। পরবর্তী আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে ঃ এসব বিভিন্ন প্রচেষ্টা দু'টি বড় বড় ভাগে বিভক্ত।

২. এটি এক ধরনের মানবিক প্রচেষ্টা। তিনটি জিনিসকে এর অংগীভূত করা হয়েছে। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, এগুলোর মধ্যে সব গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছে। এর

মধ্যে একটি হচ্ছে, মানুষ যেন অর্থ লিপ্সায় ডুবে না যায়। বরং নিজের অর্থ-সম্পদ, যে পরিমাণ আল্লাহ তাকে দিয়েছেন, তা আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের অধিকার আদায়ে, সৎ-কাজে এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে সাহায্য করার কাজে ব্যয় করে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তার মনে যেন আল্লাহর ভয় জাগরুক থাকে। সে যেন নিজের যাবতীয় কর্ম, আচার-আচরণ, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি জীবনের প্রতিটি বিভাগে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে এমন প্রত্যেকটি কাজ থেকে দূরে থাকে। আর তৃতীয়টি হচ্ছে, সে যেন সৎবৃত্তি ও সৎকাজের সত্যতার স্বীকৃতি দেয়। সৎবৃত্তি ও সৎকাজ অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক। বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র ও কর্ম তিনটি সৎবৃত্তির অন্তরভুক্ত। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সৎবৃত্তির স্বীকৃতি হচ্ছে, শিরক, কুফরী ও নাস্তিক্যবাদ পরিত্যাগ করে মানুষ তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতকে সত্য বলে মেনে নেবে। আর কর্ম ও নৈতিক চরিত্রের ক্ষেত্রে সৎবৃত্তির স্বীকৃতি হচ্ছে, কোন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা ও পদ্ধতি ছাড়াই নিছক নিজের অজ্ঞাতসারে কোন সৎকাজ সম্পাদিত হওয়া নয় বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণ ও সৎবৃত্তির যে ব্যবস্থা দান করা হয়েছে মানুষ তার সত্যতার স্বীকৃতি দেবে। আল্লাহ শরীয়াত নামক যে ব্যাপকতর ব্যবস্থাটি দান করেছেন এবং যার মধ্যে সব ধরনের ও সকল প্রকার সৎবৃত্তি ও সৎকাজকে সুশৃংখলভাবে একটি ব্যবস্থার আওতাধীন করেছেন, মানুষ তাকে স্বীকার করে নিয়ে সেই অনুযায়ী সৎকাজ করবে।

৩. এটি হচ্ছে এই ধরনের প্রচেষ্টার ফল। সহজ পথ মানে মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতির সাথে মিল রয়েছে এমন পথ। যে স্রষ্টা মানুষ ও এই সমগ্র বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করেছেন তিনি যেমন চান তেমন পথ। যে পথে নিজের বিবেকের সাথে লড়াই করে মানুষকে চলতে হয় না। যে পথে মানুষকে নিজের দেহ, প্রাণ,বুদ্ধি ও মনের শক্তিগুলোর ওপর জোর খাটিয়ে যে কাজের জন্যে তাদেরকে এ শক্তি দান করা হয়নি জবরদস্তি তাদের থেকে সেই কাজ আদায় করে নিতে হয় না। বরং তাদের থেকে এমন কাজ নেয় যে জন্য তাদেরকে প্রকৃতপক্ষে এই শক্তিগুলো দান করা হয়েছে। পাপপূর্ণ জীবনে চতুরদিকে যেমন প্রতি পদে পদে সংঘাত, সংঘর্ষ ও বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়, এ পথে মানুষকে তেমনি ধরনের কোন বাধা ও সংঘাতের সম্মুখীন হতে হয় না। বরং মানুষের সমাজে প্রতি পদে পদে সে সহানুভূতি, সহযোগিতা, প্রেম, ভালোবাসা, মর্যাদা ও সম্মান লাভ করতে থাকে। একথা সুস্পষ্ট, যে ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ মানুষের সেবায় নিয়োজিত করে, সবার সাথে ভালো ব্যবহার করে, নিজের জীবনকে অশ্লীল কার্যকলাপ ও দুষ্কৃতিমুক্ত রাখে, নিজের লেন-দেনের ব্যাপারে পরিচ্ছন্ন ও ন্যায়-নিষ্ঠ থাকে, কারো সাথে বেঈমানী, শপথ ভংগ ও বিশ্বাসঘাতকতা করে না, যার পক্ষ থেকে কারোর প্রতি জুলুম, নির্যাতন ও অন্যায় আচরণের আশংকা থাকে না। যে প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং যার চরিত্র ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করার সুযোগ কারোর থাকে না, সে যতই নষ্ট ও ভ্রষ্ট সমাজে বাস করুক না কেন সেখানে অবশ্যি সে মর্যাদার আসনে সমাসীন থাকে। মানুষের মন তার দিকে আকৃষ্ট হতে থাকে। মানুষের হৃদয়ে তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তার নিজের মন ও বিবেকও নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। সমাজে তার এমন মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়, যা কোন অসৎব্যক্তি ও দুষ্কৃতকারী কোন দিন লাভ করতে পারে না। একথাটিকেই সূরা আন্ নাহলে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মু'মিন হলে আমি অবশ্যি তাকে ভালো জীবন যাপন করাবো।" (৯৭ আয়াত)

আবার একথাটি সূরা মারয়ামে নিম্নোক্তভাবে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا –

"নিসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে এবং যারা সৎকাজ করেছে রহমান তাদের জন্য হৃদয়গুলোতে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন।"(৯৬ আয়াত)

তাছাড়া এটিই মানুষের জন্য দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত পূর্ণ আনন্দের একমাত্র পথ। একমাত্র এ পথেই আছে আরাম ও প্রশান্তি। এর ফলাফল সাময়িক ও ক্ষণকালীন নয় বরং এটা হচ্ছে চিরন্তন ও চিরস্থায়ী ফল, এর কোন ক্ষয় নেই।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলছেন, আমি তাকে এ পথে চলার সহজ সুযোগ দেবো। এর মানে হচ্ছে, যখন সে সৎবৃত্তিকে স্বীকার কনে নিয়ে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে যে, এটিই তার উপযোগী পথ এবং দুষ্কৃতির পথ তার উপযোগী নয়, আর যখন সে কার্যত আর্থিক ত্যাগ ও তাকওয়ার জীবন অবলম্বন করে একথা প্রমাণ করবে যে, তার এই স্বীকৃতি সত্য, তখন আল্লাহ এ পথে চলা তার জন্য সহজ করে দেবেন। এ অবস্থায় তার জন্য আবার গোনাহ করা কঠিন এবং নেকী করা সহজ হয়ে যাবে। হারাম অর্থ–সম্পদ তার সামনে এলে সে তাকে লাভের সওদা মনে করবে না। বরং সে অনুভব করবে, এটা জ্বলন্ত অংগার, একে সে হাতের তালুতে উঠিয়ে নিতে পারে না। ব্যভিচারের সুযোগ সে পাবে। কিন্তু তাকে সে ইন্দ্রিয় লিপ্সা চরিতার্থ করার সুযোগ মনে করে সেদিকে পা বাড়াবে না। বরং জাহান্নামের দরজা মনে করে তা থেকে দূরে পালিয়ে যাবে। নামায তার কাছে কঠিন মনে হবে না বরং নামাযের সময় হয়ে গেলে নামায না পড়া পর্যন্ত তার মনে শান্তি আসবে না। যাকাত দিতে তার মনে কষ্ট হবে না। বরং যাকাত আদায় না করা পর্যন্ত নিজের ধন–সম্পদ তার কাছে নাপাক মনে হবে। মোটকথা, প্রতি পদে পদে আল্লাহর পক্ষ থেকে এই পথে চলার সুযোগ ও সুবিধা সে লাভ করতে থাকবে। অবস্থাকে তার উপযোগী বানিয়ে দেয়া হবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে সাহায্য করা হবে।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয়, ইতিপূর্বে সূরা আল বালাদে এ পথটিকে দুর্গম পার্বত্য পথ বলা হয়েছিল আর এখানে একে বলা হচ্ছে, সহজ পথ। এই দু'টি কথাকে কিভাবে এক করা যাবে? এর জবাব হচ্ছে, এই পথ অবলম্বন করার আগে এটা মানুষের কাছে দুর্গম পার্বত্য পথই মনে হতে থাকে। এ উঁচু দুর্গম পার্বত্য পথে চলার জন্য তাকে নিজের প্রবৃত্তির লালসা নিজের বৈষয়িক সার্থের অনুরাগী পরিবার পরিজন, নিজের আত্মীয়–স্বজন, বন্ধু–বান্ধব ও কাজ–কারবারের লোকজন এবং সবচেয়ে বেশী শয়তানের সাথে লড়াই করতে হয়। কারণ এদের প্রত্যেকেই তাকে এ পথে চলতে বাধা দেয় এবং একে ভীতিপ্রদ বানিয়ে তার সামনে হাযির করে। কিন্তু যখন মানুষ সৎবৃত্তির স্বীকৃতি দিয়ে সে পথে চলার সংকল্প করে, নিজের ধন–সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে কার্যত এই সংকল্পকে পাকাপোক্ত করে নেয়, তখন এই দুর্গম পথ

পাড়ি দেয়া তার জন্য সহজ এবং নৈতিক অবনতির গভীর খাদে গড়িয়ে পড়া কঠিন হয়ে পড়ে।

৪. এটি দ্বিতীয় ধরনের মানসিক প্রচেষ্টা। প্রথম ধরনের প্রচেষ্টাটির সাথে প্রতি পদে পদে রয়েছে এর অমিল। কৃপণতা মানে শুধুমাত্র প্রচলিত অর্থে যাকে কৃপণতা বলা হয় তা নয়। অর্থাৎ এক একটি পয়সা গুণে গুণে রাখা, খরচ না করা, না নিজের জন্য না নিজের ছেলেমেয়ের জন্য। বরং এখানে কৃপণতা বলতে আল্লাহর পথে এবং নেকী ও কল্যাণমূলক কাজে অর্থ ব্যয় না করা বুঝাচ্ছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে এমন ব্যক্তিকেও কৃপণ বলা যায়, যে নিজের জন্য, নিজের আরাম-আয়েশ ও বিলাস-ব্যাসনের স্বার্থে এবং নিজের ইচ্ছামতো খুশী ও আনন্দ বিহারে দু'হাতে টাকা উড়ায় কিন্তু কোন ভালো কাজে তার পকেট থেকে একটি পয়সাও বের হয় না। অথবা কখনো বের হলেও তার পেছনে থাকে এর বিনিময়ে দুনিয়ার খ্যাতি, যশ, শাসকদের নৈকট্য লাভ বা অন্য কোন রকমের পার্থিব স্বার্থ উদ্ধার। বেপরোয়া হয়ে যাওয়ার অর্থ দুনিয়ার বৈষয়িক লাভ ও স্বার্থকে নিজের যাবতীয় প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের লক্ষে পরিণত করা এবং আল্লাহর ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে যাওয়া। কোন্ কাজে আল্লাহ খুশী হন এবং কোন্ কাজে নাখোশ হন তার কোন তোয়াক্কা না করা। আর সৎবৃত্তিকে মিথ্যা গণ্য করার মানে হচ্ছে, সৎকাজকে তার সকল বিস্তারিত আকারে সত্য বলে মেনে না নেয়া এখানে এর ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ ইতিপূর্বে সৎবৃত্তিকে সত্য বলে মেনে নেয়ার বিষয়টি আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি।

৫. এ পথকে কঠিন বলার কারণ হচ্ছে এই যে, এ পথে যে পাড়ি জমাতে চায় সে যদিও বৈষয়িক লাভ, পার্থিব ভোগ-বিলাস ও বাহ্যিক সাফল্যের লোভে এ দিকে এগিয়ে যায় কিন্তু এখানে সর্বক্ষণ তাকে নিজের প্রকৃতি, বিবেক, বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টার তৈরি করা আইন এবং তার চারপাশের সমাজ পরিবেশের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়। সততা, ন্যায় পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা, ভদ্রতা, চারিত্রিক পরিচ্ছন্নতা ও নীতি-নৈতিকতার সীমালংঘন করে যখন সে সর্বপ্রকারে নিজের স্বার্থসিদ্ধি ও লোভ-লালসা পূর্ণ করার প্রচেষ্টা চালায়, যখন তার মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টির কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ হতে থাকে এবং সে অন্যের অধিকার ও মর্যাদার ওপর হস্তক্ষেপ করতে থাকে তখন নিজের চোখেই সে লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত জীবে পরিণত হয় এবং যে সমাজে সে বাস করে সেখানেও তাকে প্রতি পদে পদে লড়াই করে এগিয়ে যেতে হয়। সে দুর্বল হলে এসব কার্যকলাপের জন্য তাকে নানা ধরনের শাস্তি ভোগ করতে হয়। আর সে ধনী, শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হলে সারা দুনিয়া তার শক্তির সামনে মাথা নত করলেও কারো মনে তার জন্য সামান্যতমও শুভাকাংক্ষা, সম্মানবোধ ও ভালোবাসার প্রবণতা জাগে না। এমন কি তার কাজের সাথী-সহযোগীরাও তাকে একজন বজ্জাত-দুর্বৃত্ত হিসেবেই গণ্য করতে থাকে। আর এ ব্যাপারটি কেবলমাত্র ব্যক্তি পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকে না। দুনিয়ার বড় বড় শক্তিশালী জাতিরাও যখন নৈতিকতার সীমানালংঘন করে নিজেদের শক্তি ও অর্থের বিভ্রমে পড়ে অসৎকাজে লিপ্ত হয় তখন একদিকে বাইরের জগত তাদের শত্রু হয়ে দাঁড়ায় এবং অন্যদিকে তাদের নিজেদের সমাজ অপরাধমূলক কার্যকলাপ, আত্মহত্যা, নেশাখোরী, দুরারোগ্য ব্যাধি, পারিবারিক জীবনের ধ্বংস, যুব সমাজের অসৎপথ অবলম্বন, শ্রেণী সংঘাত এবং জুলুম নিপীড়নের

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴿١٢﴾ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ﴿١٣﴾ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴿١٤﴾ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿١٥﴾ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٦﴾ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿١٧﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ ﴿١٩﴾ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٠﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿٢١﴾

নিসন্দেহে পথনির্দেশ দেয়া তো আমার দায়িত্বের অন্তরভুক্ত।[৭] আর আসলে আমি তো আখেরাত ও দুনিয়া উভয়েরই মালিক।[৮] তাই আমি তোমাদের সাবধান করে দিয়েছি জ্বলন্ত আগুন থেকে । যে চরম হতভাগ্য ব্যক্তি মিথ্যা আরোপ করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সে ছাড়া আর কেউ তাতে ঝলসে যাবে না। আর যে পরম মুত্তাকী ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জনের জন্য নিজের ধন–সম্পদ দান করে তাকে তা থেকে দূরে রাখা হবে।[৯] তার প্রতি কারো কোন অনুগ্রহ নেই যার প্রতিদান তাকে দিতে হবে। সেতো কেবলমাত্র নিজের রবের সন্তুষ্টিলাভের জন্য এ কাজ করে।[১০] আর তিনি অবশ্যি (তার প্রতি) সন্তুষ্ট হবেন।[১১]

বিপুলাকার রোগে আক্রান্ত হয়। এমন কি উন্নতির উচ্চতম শিখর থেকে একবার পতন ঘটার পর ইতিহাসের পাতায় তাদের জন্য কলংক, লানত ও অভিশাপ ছাড়া আর কিছুই থাকেনি।

আর এই ধরনের লোককে আমি কঠিন পথে চলার সুবিধা দেবো, একথা বলার মানে হচ্ছে, তার থেকে সৎপথে চলার সুযোগ ছিনিয়ে নেয়া হবে। অসৎপথের দরজা তার জন্য খুলে দেয় হবে। অসৎকাজ করার যাবতীয় উপকরণ ও কার্যকারণ তার জন্য সংগ্রহ করে দেয়া হবে। খারাপ কাজ করা তার জন্য সহজ হবে এবং ভালো কাজ করার চিন্তা মনে উদয় হওয়ার সাথে সাথেই সে মনে করবে এই বুঝি তার দম বন্ধ হয়ে যাবে। এই অবস্থাটিকেই কুরআনে অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহ যাকে পথ দেখাবার সংকল্প করেন তার বক্ষদেশ ইসলামের জন্য খুলে দেন। আর যাকে তিনি গোমরাহীর মধ্যে ঠেলে দেবার এরাদা করেন তার বক্ষদেশকে সংকীর্ণ করে দেন এবং তাকে এমনভাবে সংকুচিত করেন যার ফলে (ইসলামের কথা মনে হলেই) সে অনুভব করতে থাকে যেন তার প্রাণবায়ু উড়ে যাচ্ছে । (আনআম ১২৫ আয়াত) আর এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ নিসন্দেহে নামায একটি অত্যন্ত কঠিন কাজ, কিন্তু আল্লাহ অনুগত বান্দার জন্য নয়।" (আল বাকারাহ ৪৬ আয়াত) আর মোনাফেকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ "তারা নামাযের দিকে এলেও গড়িমসি করে আসে এবং আল্লাহর পথে খরচ করলেও যেন মন চায় না তবুও খরচ

করে।" (আত তাওবাহ ৫৪ আয়াত) আরো বলা হয়েছে ঃ "তাদের মধ্যে এমন সব লোক রয়েছে যারা আল্লাহর পথে কিছু খরচ করলে তাকে নিজেদের ওপর জবরদস্তি আরোপিত জরিমানা মনে করে।" (আত তাওবাহ ৯৮ আয়াত)

৬. অন্য কথায় বলা যায়, একদিন তাকে অবশ্যি মরতে হবে। তখন এখানে আয়েশ আরামের জন্য সে যা কিছু সংগ্রহ করেছিল সব এই দুনিয়াতেই রেখে যেতে হবে। যদি নিজের আখেরাতের জন্য এখান থেকে কিছু কামাই করে না নিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে দুনিয়ার এ ধন–সম্পদ তার কোন্ কাজে লাগবে? সে তো কোন দালান কোঠা, মোটরগাড়ি, সম্পত্তি বা জমানো অর্থ সংগে করে কবরে যাবে না।

৭. অর্থাৎ মানুষের স্রষ্টা হবার কারণে মহান আল্লাহ নিজের জ্ঞানপূর্ণ কর্মনীতি, ন্যায়নিষ্ঠা ও রহমতের ভিত্তিতে নিজেই মানুষকে এ দুনিয়ায় এমনভাবে ছেড়ে দেননি যে, সে কিছুই জানে না। বরং সঠিক পথ কোন্‌টি ও ভুল পথ কোন্‌টি, নেকী, গোনাহ, হালাল ও হারাম কি, কোন্ কর্মনীতি তাকে নাফরমান বান্দার ভূমিকায় এনে বসাবে—এসব কথা জানিয়ে দেবার দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করেছেন।

একথাটিকেই সূরা আন নাহ্‌লে এভাবে বলা হয়েছে ঃ وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ "আর সোজা পথ দেখাবার দায়িত্ব আল্লাহরই ওপর বার্তায় যখন বাঁকা পথও রয়েছে।" (৯ আয়াত) ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আন নাহ্‌ল, ৯ টীকা।

৮. এ বক্তব্যটির কয়েকটি অর্থ হয়। সবগুলো অর্থই সঠিক। এক, দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত কোথাও তোমরা আমার নিয়ন্ত্রণ ও পাকড়াও এর বাইরে অবস্থান করছো না। কারণ আমিই উভয় জাহানের মালিক । দুই, তোমরা আমার দেখানো পথে চলো বা না চলো আসলে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের ওপর আমার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত। তোমরা ভুল পথে চললে তাতে আমার কোন ক্ষতি হবে না, তোমাদের ক্ষতি হবে। আর তোমরা সঠিক পথে চললে আমার কোন লাভ হবে না, তোমরাই লাভবান হবে। তোমাদের নাফরমানির কারণে আমার মালিকানায় কোন কমতি দেখা দেবে না এবং তোমাদের আনুগত্য তার মধ্যে কোন বৃদ্ধিও ঘটাতে পারবে না। তিন, আমিই উভয় জাহানের মালিক। দুনিয়া তথা বৈষয়িক স্বার্থ চাইলে তা আমার কাছ থেকেই তোমরা পাবে। আবার আখেরাতের কল্যাণ চাইলে তাও দেবার ক্ষমতা একমাত্র আমারই আছে। একথাটিই সূরা আলে ইমরানের ১৪৫ আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا

"যে ব্যক্তি দুনিয়ায় সওয়াব হাসিলের সংকল্পে কাজ করবে আমি তাকে দুনিয়া থেকেই দেবো আর যে ব্যক্তি আখেরাতের সওয়াব হাসিলের সংকল্পে কাজ করবে আমি তাকে আখেরাত থেকে দেবো।"

সূরা শুরা ২০ আয়াতে একথাটি নিম্নোক্তভাবে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ –

"যে ব্যক্তি আখেরাতের কৃষি চায় তার কৃষিকে আমি বাড়িয়ে দেই আর যে দুনিয়ার কৃষি চায় তাকে দুনিয়া থেকেই দান করি, কিন্তু আখেরাতে তার কোন অংশ নেই।"

আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আলে ইমরান ১০৫ টীকা এবং আশ শূরা ৩৫ টীকা।

৯. এর অর্থ এই নয় যে, চরম হতভাগ্য ছাড়া আর কেউ জাহান্নামে যাবে না এবং পরম মুত্তাকী ছাড়া আর কেউ তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। বরং দু'টি চরম পরস্পর বিরোধী চরিত্রকে পরস্পরের বিরুদ্ধে পেশ করে তাদের পরস্পর বিরোধী চরম পরিণাম বর্ণনা করাই এখানে উদ্দেশ্য। এক ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের শিক্ষাকে মিথ্যা বলে এবং আনুগত্যের পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেবল ঈমান এনেই ক্ষান্ত হয় না বরং পরম আন্তরিকতা সহকারে কোন প্রকার লোক দেখানো প্রবণতা, নাম যশ ও খ্যাতির মোহ ছাড়াই শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে পাক-পবিত্র মানুষ হিসেবে গণ্য হবার আকাংখায় আল্লাহর পথে নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। এই দু' ধরনের চরিত্র সম্পন্ন লোক সে সময় মক্কার সমাজে সবার সমানে বর্তমান ছিল। তাই কারো নাম না নিয়ে লোকদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে, জাহান্নামের আগুনে দ্বিতীয় ধরনের চরিত্র সম্পন্ন লোক নয় বরং প্রথম ধরনের চরিত্র সম্পন্ন লোকই পুড়বে। আর এই আগুন থেকে প্রথম ধরনের লোক নয় বরং দ্বিতীয় ধরনের লোককেই দূরে রাখা হবে।

১০. এখানে সেই মুত্তাকী ও আল্লাহভীরু ব্যক্তির আন্তরিকতার আরো বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। সে নিজের অর্থ যাদের জন্য ব্যয় করে, আগে থেকেই তার কোন অনুগ্রহ তার ওপর ছিল না, যার বদলা সে এখন চুকাচ্ছে অথবা ভবিষ্যতে তাদের থেকে আরো স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তাদেরকে উপহার উপঢৌকন ইত্যাদি দিচ্ছে এবং তাদেরকে দাওয়াত খাওয়াচ্ছে। বরং সে নিজের মহান ও সর্বশক্তিমান রবের সন্তুষ্টিলাভের জন্য এমনসব লোককে সাহায্য করছে, যারা ইতিপূর্বে তার কোন উপকার করেনি এবং ভবিষ্যতেও তাদের উপকার করার কোন আশা নেই। এর সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর গোলাম ও বাঁদীদের আযাদ করার কাজটি। মক্কা মু'আয্‌যমার যে অসহায় গোলাম ও বাঁদীরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং এই অপরাধে তাদের মালিকরা তাদের ওপর চরম অকথ্য নির্যাতন ও নিপীড়ন চালাচ্ছিল হযরত আবু বকর (রা) তাদেরকে মালিকদের জুলুম থেকে বাঁচাবার জন্য কিনে নিয়ে আযাদ করে দিচ্ছিলেন। ইবনে জারীর ও ইবনে আসাকির হযরত আমের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের এই রেওয়ায়াতটি উদ্ধৃত করেছেন ঃ হযরত আবু বকরকে এভাবে গরীব গোলাম ও বাঁদীদেরকে গোলামী মুক্ত করার জন্য অর্থ ব্যয় করতে দেখে তাঁর পিতা তাকে বলেন, হে পুত্র! আমি দেখছি তুমি দুর্বল লোকদের মুক্ত করে দিচ্ছো, যদি এ টাকাটা তুমি শক্তিশালী জোয়ানদের মুক্ত করার জন্য খরচ করতে তাহলে তারা তোমার হাতকে শক্তিশালী করতো। একথায় হযরত আবু বকর (রা) তাঁকে বলেনঃ اى اباه انما اريد ما عندالله 'আব্বাজান! আমি তো আল্লাহর কাছে এর প্রতিদান চাই।"

১১. এ আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে। দু'টি অর্থই সঠিক। একটি অর্থ হচ্ছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। আর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, শীঘ্রই আল্লাহ এ ব্যক্তিকে এতসব কিছু দেবেন যার ফলে সে খুশী হয়ে যাবে।